অর্থনীতির স্বাস্থ্য আর কর্মসংস্থানে নজর দিল না বাজেট

খানিক প্রশংসা প্রাপ্য বটে

মৈত্রীশ ঘটক

২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮, ০০:৩৬:৩৪
শেষ আপডেট: ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮, ২২:৩৮:৫৬

‘বাজেট’ শব্দটা শুনলেই কেমন যেন একটা টানাটানির কথা মনে হয়— সাধ আর সাধ্যের মধ্যে। সব পেয়েছির দেশে কি আর বাজেটের দরকার আছে? টানাটানি যেমন সত্য, তাই বাজেট মানেই এক অন্তর্নিহিত উৎকণ্ঠাও সত্য। কে পাবে, আর কে পাবে না? কোন ক্ষেত্রটা গুরুত্ব পাবে?

যদিও সব বাজেটের ক্ষেত্রেই এই উৎকণ্ঠা সত্য, কিন্তু কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বাজেটের সঙ্গে সরকারের বাজেটের ফারাক আছে। প্রথম এবং অবধারিত ফারাকটা হল, সরকারের বাজেটের পরিমাণ বিপুল, যে-কোনও দেশের অর্থনীতির একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে দেশের বাজেট। যেমন, ভারতের এই বাজেটে সরকারের খরচের পরিমাণ দেশের জাতীয় আয়ের ১৩%, আর সরকারের সামগ্রিক ঋণের পরিমাণ জাতীয় আয়ের ৭০%। তার ওপর, কোনও ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক নীতি বা স্বাস্থ্য গোলমেলে হলে তাকে এড়িয়ে চলা যায়, এমনকী তাকে পথে বসতে দিতেও সমস্যা নেই, কিন্তু আর্থিক ভাবে সরকারকে এড়ানোর কোনও উপায় নেই (কর ফাঁকি দিতে পারেন অবশ্য, কিন্তু সেটা অন্য কথা)। সাধে কী বলে, এক

দিন মারা যেতে হবে, আর প্রতি বছর সরকারকে কর দিতে হবে, এই দুটো ছাড়া জীবনে আর কিছুই নিশ্চিত নয়!

এই মৌলিক টানাটানির কথা মাথায় রেখেই অরুণ জেটলির বর্তমান বাজেটটাকে তিন দিক থেকে বিচার করা যায়। প্রথমটা হল বাজেটে থাকা প্রত্যক্ষ পুনর্বণ্টনের নীতি। বিভিন্ন কর, ভর্তুকি এবং ব্যয়বরাদ্দের মাধ্যমে সম্পদের পুনর্বণ্টন হয়— সেই খেলায় জনগোষ্ঠীর কোনও অংশ জেতে, আবার কোনও অংশ হারে। খেয়াল করে দেখবেন, প্রতিটি বাজেটের পরেই বিশ্লেষণ আরম্ভ হয়, বাজেটটি 'কর্পোরেট-বান্ধব', না কি 'পপুলিস্ট', গরিবের বাজেট না বড়লোকের।

দ্বিতীয়ত, যে-সব পণ্য এবং পরিষেবায় প্রত্যেকের সমান অধিকার, অর্থনীতির পরিভাষায় যাকে 'পাবলিক গুডস' বলা হয়, তার জন্য ব্যয়বরাদ্দ। পরিকাঠামো হোক বা পরিবেশ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা অথবা শিক্ষা-স্বাস্থ্য বা সার্বিক ভাবে আরও ভাল প্রশাসনের ব্যবস্থা করার জন্য বিনিয়োগের ওপর বাজেটবরাদ্দ দেশের অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি ক্ষমতা ও মানুষের জীবনের গুণমানের উন্নতি নির্ভর করে।।

তৃতীয়ত, দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন বাদ দিলেও, বাজেটের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের ওপর। যেমন, রাজকোষ ঘাটতির পরিমাণ যদি বাড়ে, তবে মূল্যস্ফীতি আরম্ভ হয়, এবং সুদের হার বাড়ে। তার প্রভাব পড়ে বেসরকারি বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং আয়বৃদ্ধির হারের ওপর।

সরকারের ঋণ বাড়া মানে ভবিষ্যতে কোনও এক সময় করের টাকা থেকেই সেই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তার অর্থ, বর্তমান প্রজন্ম ভবিষ্যতের থেকে ধার করে নিজেদের খরচ মেটাচ্ছে। ফলে, পরিকাঠামো তৈরি অথবা মানবসম্পদ উন্নয়ন ছাড়া অন্য কোনও কাজের জন্য সরকারের ঋণের পরিমাণ বাড়ানো যেমন নৈতিক ভাবে ঠিক নয়, তেমনই অর্থনীতির যুক্তিতেও বিপজ্জনক।

বাজেট কেমন হল, মাপার একটা চটজলদি উপায় শেয়ার বাজারের দিকে তাকানো। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ-এর সূচক সেনসেক্স খুব অল্প পরিমাণে হলেও গত কালের তুলনায় কমেছে। অনুমান করা যায়, এটা ইক্যুইটিতে বিনিয়োগে এক লক্ষ টাকার বেশি দীর্ঘকালীন মূলধনী লাভের ওপর ১০% কর বসানোর প্রতিক্রিয়া। গত বছর বাজেটের দিন সেনসেক্স বেড়েছিল ১.৭৬%— ২০০৫ সালের পর বাজেটের দিনে সেনসেক্সের সর্বোচ্চ বৃদ্ধি। এই করের সিদ্ধান্তটিকে স্বাগত না জানিয়ে উপায় নেই। সম্প্রতি অক্সফ্যামের সমীক্ষা জানাল, ২০১৭ সালে দেশে মোট যত সম্পদ তৈরি হয়েছে, তার ৭৩% মাত্র এক শতাংশ মানুষের কুক্ষিগত। আর দেশের দরিদ্রতর ৫০ শতাংশের সম্পদের পরিমাণ এক বছরে বেড়েছে মাত্র এক শতাংশ। হরিপদ কেরানির মাইনের ওপর আয়কর আদায় করব, সেভিংস অ্যাকাউন্ট বা ফিক্সড ডিপোজিটের সুদের ওপর কর চাপাব, কিন্তু শেয়ার বাজারের মূলধনী আয়কে করমুক্ত রাখব, এর কোনও যুক্তি থাকতে পারে না।

‘পপুলিজম’-এর বিপদের কথা তো হরহামেশাই শুনি। ‘এলিট ক্যাপচার’, অর্থাৎ সব কিছুই ক্ষমতাবানদের কবজায় চলে যাওয়ার বিপদের কথাগুলো বলারও সময় এসেছে। ভারতে বিলিয়নেয়ারের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, কিন্তু আন্তর্জাতিক স্তরে লড়তে পারার মতো ক’টা পণ্য আজ অবধি তাঁরা তৈরি করতে পেরেছেন? ভারতের কর্পোরেট ক্ষেত্র আসলে একটা নিয়ন্ত্রিত ও বদ্ধ বাজারের সুবিধা নিয়ে চলেছে, উদ্ভাবনী শক্তি এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মঞ্চে মুনাফা অর্জন করতে পারেনি। তার চেয়েও বড় কথা, ভারতের মোট শ্রমশক্তির নিরিখে কর্পোরেট ক্ষেত্রের মাপ যতটুকু, তাতে কর্মসংস্থানের যুক্তিতেও কোনও বাড়তি সুবিধা তার প্রাপ্য হয় না। দীর্ঘমেয়াদি মূলধনী লাভের ওপর কর বসানোর সিদ্ধান্তটি, তা যতই সীমিত হোক না কেন, তাই তারিফ করার মতোই।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রের দিকে এই বাজেট যে নজর দিয়েছে, তার জন্যও তারিফ প্রাপ্য। ন্যাশনাল হেল্থ প্রোটেকশন স্কিম-এর অধীনে দেশের দশ কোটি পরিবার, অর্থাৎ মোট পরিবারের এক-তৃতীয়াংশ, হাসপাতালের খরচ বাবদ বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা অবধি স্বাস্থ্যবিমা পাবে। এই বিপুল খরচের জন্য অর্থসংস্থান হবে কীভাবে, এবং কীভাবে এই প্রকল্পটি সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার ওপর প্রভাব ফেলবে, এখনই তা বলা মুশকিল। কিন্তু, পদক্ষেপটি প্রশংসনীয়।

কৃষিক্ষেত্রের প্রতি মনোযোগ দেওয়াও এই বাজেটের একটা বড় দিক। তবে, সেটা অবিমিশ্র ভাল নয়। কৃষি পরিকাঠামোর দিকে নজর দেওয়া হয়েছে, তা সুসংবাদ। কিন্তু, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়ানোর সিদ্ধান্তটি কাজের নয়। কারণ, সরকার বাজারচলতি দামের চেয়ে বেশি দামে শস্য কিনবে বলে জানিয়ে দিলেই উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে এবং ফসল নষ্ট হয়। এবং, এই নীতিটি ধনী কৃষকদের বেশি কাজে আসে—যার উৎপাদন যত বেশি, তার প্রাপ্য ভরতুকির পরিমাণও ততই বেশি। বরং, প্রত্যক্ষ নগদ হস্তান্তরের নীতি, বিমাপ্রকল্পের প্রসার বা গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের ওপর ব্যয়বরাদ্দ বাড়ানো অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হত।

সম্পদের পুনর্বণ্টন এবং ‘পাবলিক গুডস’-এ খরচের ক্ষেত্রে এই বাজেট যথেষ্ট প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু, অর্থনীতির স্বাস্থ্যের কথা বিচার করলে অতটা নম্বর দেওয়া যাবে না। এই অর্থবর্ষে রাজকোষ ঘাটতির পরিমাণ জাতীয় আয়ের ৩.২ শতাংশে বেঁধে রাখার কথা ছিল। সেটা ঠেকেছে সাড়ে তিন শতাংশে। আগামী অর্থবর্ষের জন্য লক্ষ্যসীমা হয়েছে ৩.২%। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়ছে, ফলে মূল্যস্ফীতির আশঙ্কা থেকেই যায়। এবং, সরকারি খরচের তালিকায় নিয়ম মেনেই এক নম্বরে আছে সুদ। বাজেটের মোট ব্যয়বরাদ্দের ২৪ শতাংশই যাবে সুদ মেটাতে। অঙ্কটা কতখানি বড়, তার একটা আন্দাজ দেওয়া যাক। খরচের অঙ্কে দু’নম্বরে আছে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়, তিন নম্বরে খাদ্যে ভরতুকি। সুদবাবদ খরচের অঙ্কটি এই দুটি খাতে খরচের যথাক্রমে দ্বিগুণ ও চার গুণ।

এই বাজেটের বৃহত্তম খামতি, কর্মসংস্থানের প্রশ্নটির কোনও যথাযথ উত্তর পাওয়া গেল না। দেশে বেকারের সংখ্যা দিনেরাতে বাড়ছে। সরকার বছরে এক কোটি কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসে আছে।

এ-দিকে, আর্থিক বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশের কম। কর্মসংস্থান না হলে ‘অচ্ছে দিন’ আসবে কোথা থেকে? যে-দেশের অর্ধেক মানুষের বয়স আঠাশের কম, সেখানে কর্মসংস্থানের প্রশ্নটির সুনির্দিষ্ট উত্তর দিতে না পারলে কোনও বাজেটই সম্পূর্ণ হয় না। নির্বাচনের পরীক্ষায় এ প্রশ্নের নম্বরই সর্বাধিক।

লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ অর্থনীতির শিক্ষক